দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা। মঙ্গলকাব্যকে পল্লীবাংলার মাটির সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের লৌকিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বাংলাদেশ আর্য অধিকার ভুক্ত হওয়ার অনেক আগে থেকেই আদিম জনজাতির লোকেরা নিজ নিজ চিন্তা ভাবনা অনুসারে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় আচার, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার পরিকল্পনা করেছিল। পরবর্তিতে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে বাংলাদেশের লোকসমাজের আদিম দেব-ভাবনা ও ধর্ম-সংস্কৃতি রূপে ও ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মূল কাঠামো পুরোপুরি পাল্টায়নি। এর ফলস্বরুপ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত লৌকিক-দেবভাবনা সমৃদ্ধ লীলা-মাহাত্ম্য কথা পাঁচালি আকারে মঙ্গলকাব্যের রূপ নিয়েছে। মঙ্গলকাব্য ধারায় আমরা সর্বপ্রথমে পাই মনসামঙ্গলকাব্যকে, এরপর একে একে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যকে। মঙ্গলকাব্য ধারায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে। সেদিক থেকে ধর্মসাহিত্য অনেকটাই নতুন। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো বিস্তারও ঘটেনি, তা বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মঠাকুরের পুজা বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পূজিত ও প্রচারিত। তথাপি ধর্মঠাকুরের স্বরূপ, উদ্ভব ইতিহাস ও ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাব্যকথার সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আমরা পূর্বেই ধর্মমঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ইতিহাস ও কাব্যের সাধারণ পরিচয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি।

ধর্মঠাকুরের পুজার নানান রীতি-নীতি, লৌকিক ঐতিহ্য, ধর্মদেবতার পরিচয় ও নিম্ন সমাজে ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা থেকে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের আধিপত্য, স্বরূপ সম্পর্কে। ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের নিম্নবর্ণের আরাধ্য দেবতা হলেও ধর্মঠাকুর পরবর্তিতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছেই পূজিত হতেন। ধর্মঠাকুরের পুজায় নিম্নশ্রেণির লোকেরা পৌরহিত্য

করলেও সময়ের সাথে সাথে ব্রাহ্মণরাও ধর্মের পুজায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। অন্যদিক থেকে দেখা যায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের রচয়িতারাও সকলেই হয় ব্রাহ্মণ বা উচ্চবৃত্ত শ্রেণীর।

রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেনির মধ্যে ডোম, বাগদী, হাঁড়ি, চণ্ডাল ইত্যাদি জাতি রয়েছে। এই অন্ত্যজ জাতির মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল, পরবর্তীতে তা অন্যান্য জাতির মধ্যেও ছড়িয়া পড়ে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মূল অবলম্বন রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির জীবনকথা, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও বীরত্ব। ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলার যে অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তা রাঢ় নামে পরিচিত ছিল এবং ধর্মঠাকুরের পূজা এই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে ধর্মঠাকুরকে নিয়ে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল এবং ধর্মমঙ্গলকাব্যে ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই বিধৃত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিরাও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী ছিলেন।

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের বন্দনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ‘ময়ূরভট্টে বন্দিব সংগীত আদ্য কবি’। এই ময়ূরভট্টই যে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি তা স্পষ্ট হয় তাঁর কাব্যে বারবার ময়ূরভট্টের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে। ঘনরাম লিখেছেন –

“হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্মসভায়।”[১]

ঘনরাম ছাড়াও রূপরাম চক্রবর্তী বলেছেন –

“ময়ূর ভট্ট কৃপান্বিত হৈল করতার।
মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার।।”[২]

মানিক গাঙ্গুলি লিখেছেন –

“বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল।।”[৩]

মানিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস – এর মতো অনেকেই কাব্য রচনা প্রসঙ্গে ময়ূরভট্টের বন্দনা করেছেন। এরপর ক্রমে আদি রূপরাম, রূপরাম চক্রবর্তী, মানিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, ঘনরাম চক্রবর্তী, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, ধর্মদাস বৈদ্য, হৃদয়রাম সাউ

অনেকেই ধর্মমঙ্গলকাব্য লিখেছেন। এদের অনেকেরই নামের সঙ্গে 'রাম' যুক্ত, কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ধর্মপূজার আদি প্রবর্তক ও প্রচারক রামাই পণ্ডিতের নামের প্রভাবের ফল; বা কোন কোন নাম একটি বিশেষ অঞ্চলে বহুকাল জনপ্রিয় থাকে। তবে আমাদের আলোচ্য কবি হল ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট।

ময়ূরভট্টের কোন পূর্ণাঙ্গ পুথি পাওয়া যায়না। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে একটি বই প্রকাশ করেন। তবে এর কোন মূল পুথি বা কোন অনুলিপি পাওয়া যায় না। ময়ূরভট্টের পুথি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে আমাদের আলোচ্য ময়ূরভট্টের প্রাপ্ত পুস্তকটি অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত। ময়ুরভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ'। ঘনরাম চক্রবর্তী বলেছেন –

"হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে"[৪]

তবে হাকন্দপুরাণ বলে স্বতন্ত্র কোন লেখা কবির নেই। ময়ূরভট্ট সর্বত্রই তাঁর কাব্যকে 'ধর্মপুরাণ', 'শ্রীধর্মপুরাণ' বলে অভিহিত করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাব্য কাহিনীর সাধারণ পরিচয় পর্বের একটি সম্যক ধারনা নেওয়া যাক, গৌড়রাজের মহাপাত্র, তাঁর শ্যালক মহামদ চক্রান্ত করে সোমঘোষ নামে এক গোয়ালাকে রাজকর না দিতে পারায় তাকে বন্দী করে রাখে। রাজা একদিন মহামদকে নিয়ে মৃগয়া করতে গিয়ে সোমঘোষকে বন্দী অবস্থায় দেখেন এবং তাকে মুক্তি দেন। কিন্তু সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ ছিলেন প্রবল প্রতাপের অধিকারী, তিনি ত্রিষষ্ঠীর শাসনকর্তা কর্ণসেনকে পরাজিত করে ইছাই ঘোষ ঢেকুরগড় স্থাপন করে স্বাধীন সামন্ত রাজায় পরিণত হলেন। গৌড়েশ্বর তাকে পরাজিত করার জন্য নয়লক্ষ সৈন্য পাঠান, কিন্তু অজয় নদের বন্যায় তার সৈন্য ভেসে যান এবং সেই সঙ্গে কর্ণসেনের ছয়পুত্র মারা যান যুদ্ধে। কর্ণসেনের পত্নীও আত্মহত্যা করলে তিনি শোকে –দুঃখে মূহ্যমান হয়ে গৌড়ে এসে আশ্রয় নেন। তখন গৌড়েশ্বর তার শ্যালিকার সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন মহামদের অমতেই। বিয়ের পর কর্ণসেন ময়নাগড়ের সামন্ত হয়ে সস্ত্রীক বসবাস শুরু করেন। এদিকে মহামদের কামরূপ অভিযান কালে তার অনুপস্থিতিতে রঞ্জাবতীর

বৃদ্ধ বরের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। এমন সময়ে একদি কর্ণসেন বিনা নিমন্ত্রণে গৌড়ে আসলে মহামদ তাকে আঁটকুড়া বলে বোন-ভগ্নীপতীকে অসম্মান করে বলে, ‘বন্ধ্যা যার রমণী আপনি আঁটকুড়া’। রঞ্জাবতী অপমানিত হয়ে সন্তান লাভের জন্য নানা ধরনের ঔষধের ব্যবহার ও তুকতাকের আশ্রয় নেন। অবশেষে ধর্মের পূজারী রামাই পণ্ডিতের উপদেশে ধর্মঠাকুরের কৃপা প্রত্যাশী হয়ে শালেভর করার ব্রত পালন করে। ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীর অসাধ্য সাধনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রাণ দান করে পুত্র সন্তানের বড় দিলেন। যথাসময়ে পুত্রসন্তানের জন্ম হল; নাম রাখা হল লাউসেন এবং তার খেলার সঙ্গী হিসাবে কর্পূর সেন নামে আর একটি শিশুর জন্ম দেন। দুই ভাই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল, তারা গৌড়রাজের হয়ে তাদের নৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এরপর লাউসেন গৌড় যাত্রা করেন এবং পথে নরখাদক বাঘ ও কুমীর হত্যা করে লাউসেন প্রথম বীরত্ব অর্জন করেন। গৌড় যাত্রাকালীন জামতী নগরের নারীরা তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে এবং নারীরাজ্য গোলাহাটের নারী নয়ানী তাকে হেঁয়ালী প্রশ্ন করে বন্দী করতে চাইলে লাউসেন ধর্মের কৃপায় সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এদিকে মহামদ লাউসেনকে জব্দ করার জন্য নানারকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। লাউসেন গৌড়ে পৌছালে তাকে গাছ তলায় রাত্রিযাপন করতে হয় এবং মহামদের চক্রান্তে তাকে হাতিচোর বলে রাজদরবারে হাজির করা হলে সে গৌড়রাজের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে এবং উপহার হিসাবে রাজার কাছ থেকে অশ্ব উপহার পেয়ে নিজের হৃতমান পুনরুদ্ধার করেন। স্বদেশে যাত্রাকালে লাউসেন নয়জন ডোম যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, এদের মধ্যে প্রধান হলেন কালুডোম, সে ময়নাগড়ের সেনাপতি হয়ে স্ত্রী লখাইকে নিয়ে গড় রক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে মহামদ কূটকৌশলের দ্বারা গৌড়েশ্বরকে বুঝিয়ে লাউসেনকে কামরূপ পাঠান বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করার জন্য। কিন্তু বর্ষার ভরা ব্রহ্মপুত্র পার করে যুদ্ধ করতে যাওয়া অসম্ভব, কিন্তু লাউসেন গৌড়ের রাজমাতা প্রদত্ত মন্ত্রপূত কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্রের জল শুকিয়ে কামরূপ জয় করল সহজেই। কাম্প্রূপ বিজয় করে ফিরবার সময় লাউসেন কামরূপের রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ

লোকবিশ্বাস সেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যবাহী মানসিক প্রক্রিয়া। এই লোকবিশ্বাস যুগ যুগ ধরে একটি শ্রেণির মানুষের আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রন করে চলেছে।

বাঙালির সামাজিক রীতির অন্যতম একটি বিষয় হল বিবাহ। এই বিবাহ মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহ শুধু দুই মনের মিলনই নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেও অনেকে মনে করেন। বিবাহকালীণ যে আচার-সংস্কারগুলি পালন করা হয়, তারও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। বাঙালি সমাজে বিবাহ ঠিক করা অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী দেখানো থেকে শুরু করে বিবাহ সমাপ্তি পর্যন্ত নানা আচার, রীতি-নীতি, সংস্কার পালন করা হয়ে থাকে। বিবাহ উপলক্ষ্যে নান ধরণের লোকাচার-সংস্কার পালন করা হত। লোকাচার পালনের অঙ্গ হিসাবে প্রথমেই বর-কনের অধিবাস অনুষ্ঠান পালন করা হত। অধিবাস উপলক্ষ্যে একটি বরণ ডালা সাজানো হত। সেখানে ধান, দূর্বা, চন্দন, হরিদ্রা, ফল, ফুল, ঘি, দই, সোনা, রূপা, তামা, গোরচনা ইত্যাদি নান প্রকার দ্রব্য বরণ ডালাতে রাখা হত –

“স্নান করাইঞা দর্ব্ব্য করাইল ভক্ষন।
গুবাক তাম্বুলে কৈল মুখের সোধন।।
পুরনারিগনে করে বিভার ব্যহার।
নাড়ায় আক্ষ্যের হাড়ি দুই সাতবার।।
হেনমতে কলিঙ্গার সুভ বিভাহ হয়।”[৫]

এই সকল বর্ণনা সমাজ বাস্তবতার জীবন্ত দলিল। সমাজে বৈবাহিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের তথ্য উঠে আসে। কলিঙ্গার বিবাহ ধার্য হওয়ার গায়ে হলুদ পর্বের লোকাচারের অনন্য বর্ণনা, চন্দ্রাতপ টাঙানো, বিভিন্ন মঙ্গলবাদ্য, সুরঝঙ্কার, হেমঘট স্থাপন, ব্রাম্মণ দ্বারা বৈদিক নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন করার কথা লিপিবদ্ধ আছে। অধিবাস অনুষ্ঠানে পুরোহিত নানা মন্ত্র পরে অধিবাসের কাজ সম্পন্ন করেন এবং পুরোহিত তা বর ও কনের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করতেন। অধিবাসের পর ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, নান্দীমুখ অনুষ্ঠান ইত্যাদি লোকাচার পালিত হত। মাটিতে বিভিন্ন প্রকার আল্পনা দিয়ে তার উপর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ষোল দেবীর শক্তির পূজা করা হত। এরপর বসুধারা অনুষ্ঠানে দেখা

করতেন। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ধারায় ময়ূরভট্ট তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন রাঢ়বঙ্গীয় সমাজের বিবাহের লোকাচার বা লোকবিশ্বাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায়, তা মধ্যযুগের অন্য কোন কবির রচনায় এত বিস্তৃত পরিসরে পাওয়া খুবই দুস্কর। কানাড়া-লাউসেনের বিবাহে বিভিন্ন বাজনা, ভোজন রসিকতার সঙ্গে চতুর্দোলার ব্যবহার যুগ পরিবেশে মানিয়ে যায়।

ময়ূরভট্টের কাব্য থেকে রাঢ়বঙ্গের নারী-পুরুষ উভয়ের প্রসাধন ও সাজসজ্জার পরিচয় পাই। রূপরামের কাব্যে দেখা যায় ইন্দ্রের সভার নটী অম্ববতী স্বর্গে নৃত্য করার সময় নানা ধরনের অলঙ্কার পরে নিজেকে সাজিয়েছেন। সাজসজ্জার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য গায়ে মাখা হত, চন্দন দিয়ে দেহ সুবাসিত করা হত এবং মালতী ফুলের মালা পরে, কাজল পরে, কপালে সিঁদুর পরে, মুখে পান দিয়ে মুখ লাল করে নিজেকে সজ্জিত করতেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গয়না পরতেন, যেমন – কানে কুণ্ডল, নাকে নাকছাবি, হাতে সোনার কঙ্কণ, বাজুবন্ধ, আঙুলে অঙ্গুরী, পায়ে নুপুর, খোঁপায় সোনার চিরুনি আঁটা থাকত তখনকার সম্পন্ন বাড়ির নারীদের। তবে নারীদের মতো এতো না হলেও রাঢ়ের পুরুষেরা কিছু কিছু গহনা পরতেন।

অদৃষ্টনির্ভর বাঙালি সমাজে ওঝা, গনৎকার ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। কোন শুভ কাজ করার জন্য পাঁজি পুঁথি দেখে শুভ লক্ষণ অর্থাৎ তিথি, নক্ষত্র বার করে দিত যাত্রাকালে যাত্রার শুভ-অশুভ বিচার বাঙালি সমাজের অন্যতম একটি সংস্কার। কোথাও যাত্রা কালে হাঁচিপড়া, জিঠি দেখা, বিড়ালে রাস্তা কাটা, কুস্বপ্ন দেখা ইত্যাদিকে অশুভ বলে মনে করা হয়। রাঢ়বাসী বাঙালির জীবন বিভিন্ন ধরনের পৌরাণিক-অপৌরাণিক মিথ, বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্র-তিথি-বার বাঙালি জীবনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তাছাড়া রয়েছে শৃগাল, কুকুর ও পশুপাখী কেন্দ্রীক সংস্কার। বিশেষ পাখির দর্শন, শ্রবণ শুভ ও অশুভ বলে বিবেচিত করা, যাত্রা কালে শৃগালের আর্তনাদ, শকুনি-গৃধিনী উড়ে যাওয়াকে অশুভ ইঙ্গিত মনে করা হত। মহামদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিমূলা রাজ্য আক্রমণকালে এই সমস্ত অশুভ ইঙ্গিতের কারণ হেতু তাঁর যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়নি বলে মনে করেন। ময়ূরভট্ট তাঁর কাব্যে লিখেছেন --

"জাত্রাকালে য়মুঙ্গল পড়ে কত আর।
ঘরে হইতে বাহির হইতে মাথে ঠেকে চাল।।
বামে কালসর্প দেখে সমুখে য়ানল।
সন্যকুম্ভ দেখে বির যাত্রা য়মুঙ্গল।।
রজক ধুইতে বস্ত্র আগে লঞা জায়।
বামেতে শ্রীকাল আসি দক্ষিণে কাঁটায়।।
হেন সব য়মঙ্গল দেখে নিরন্তর।
কিছুই নাহিক মানে ইছাই কোঙর।।"[৬]

ইছাই ঘোষ লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা কালে এই সব অমঙ্গলসূচক চিহ্ন গুলি দেখতে পায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা, বামদিকে কালসর্প দেখা, সামনে শৃগাল দেখা, ধোপাকে কাপড় ধুয়ে নিয়ে যেতে দেখা, পথচলতি সময়ে শৃগাল বামদিক থেকে পথ অতিক্রম করে ডানদিকে যাওয়া অমঙ্গলসূচক বলে মনে করা হয়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধারায় আমরা দেখি, মানুষের জীবনে আশীর্বাদের সাথে তাদের জীবনে অভিশাপও নেমে আসত। স্বল্পায়ু জীবনের আশীর্বাদ, কখনও সবংশে নাশ করার অভিশাপ দেওয়া হত। আমরা যদি মঙ্গলকাব্যের গোড়ার দিকে তাকাই তবে দেখা যায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে দেবসভায় দেব-দেবীরা অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করতেন। আবার অন্যদিকে দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থায় কৌলীন্যপ্রথার পরিচয়ের দিকটিও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আরো বিভিন্ন ধরনের সমাজ-সংস্কার বিষয়ক রীতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। যেমন, ভাশুর ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক, শাশুড়ী-জামাতার সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। আমরা দেখতে পাই ভাশুর-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ ভাশুরের নাম নিত না , এমনকি তার মুখ দর্শন করাও নিয়মের জাতাকলে নিষিদ্ধ ছিল। দেবসমাজেও এই রীতি পালিত হত। যেমন ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় পার্বতী ব্রহ্মার জপমালা ও কাটারি দেখেই লজ্জায় পালিয়ে যান –

"মালা দেখি চমকিত (হইল) হৃদয়।
বিস্ময় মানি (এঞা) চণ্ডি রাজার আগে কয়।।

আম্মার ভাসুর ব্রহ্মা তার জপ্য মালা।
সম্মুখে রহিল দেখ য়াগুলি দুআরা।।
কেমনে ছুইঞা মালা হৈব বাহিরে।
রাখিতে নারিল য়াজি কহিল তোমারে।।”[৭]

সামাজিক রীতির মধ্যে দেখা যায় ভ্রাতৃবধূ ভাশুরকে দেখে ঘোমটা দেয়, আবার জামাই সামনে এলে শ্বাশুড়ীর ঘোমটা দেওয়ার বিধি ছিল। তাইতো লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার বিবাহে শিবঠাকুর সম্প্রদান করেন; সেই সম্পর্কে পার্বতী শ্বাশুড়ী হওয়ায় তিনি জামাইয়ের সামনে ঘোমটা দেন।

ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। কবিদের বর্ণনা থেকে জানা যায় সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদে পোশাকের রকম ভেদ ছিল। সমাজে উচ্চশ্রেণির মানুষদের পোশাকের রকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিম্নশ্রেণির মানুষদের পোশাকে তেমন বৈচিত্র্য ছিল না। পুরুষেরা একখণ্ড নোংরা কাপড় আর নারীরা লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্র খণ্ড পড়ে থাকত।

মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে কখনো দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, কখনো বা শিথিল, আবার বৃত্তিগত সংগ্রামে মুখর। দেখা যায় কোন কোন মানুষ মূল্যবোধ তথা মানবতাবোধের উচ্চতম শিখরে, আবার কেউ কেউ অবনমিত মূল্যবোধের স্খলনে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নি, মামা-ভাগ্নে, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে কখনো গভীর হৃদয়পাশে আবদ্ধ, কখনো সাপে-নেউলে। লোভ লালসা, কামনা-বাসনা ভরা মানুষের উত্থান-পতনে রক্তমাংসের সজীবতার পরিচয় প্রদান করেছে।

কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন সর্ববিদ্যা পারঙ্গম, অন্ত্যজদের বন্ধু, বীরত্বের অধিকারী। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে নিজরাজ্যে বসতি স্থাপন করিয়ে ও বৃত্তিদান করে লাউসেন যোগ্য শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সুতরাং আমরা ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ-সস্কার ও জীবনচর্চার এক বিশেষ দিকের উন্মেষের পরিচয় লাভ করেছি। ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের কবি, তাই তার কাব্যে অষ্টাদশ শতকের জনজীবনের

ছবি আমরা দেখতে পাই। রাজা বা শাসন কর্তার সঙ্গে প্রজার একটা গভীর সম্পর্ক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ দায়িত্বে সমাজে অংশগ্রহন ও জীবিকা নির্বাহ করেছে এবং রাজার প্রতি আনুগত্যে প্রানপাত করে দেশ রক্ষা করেছে, যা মধ্যযুগের যুগসম্পদে পরিণত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা রাঢ়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় অনুসন্ধানে বিভিন্ন লোকাচার, আচার-সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছি। সমাজ-সংস্কৃতির ধারায় মৃত্যুকালীন লোকাচার একটি বিশিষ্ট লোকাচার। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি এমন কোন কাজ নেই যা করতে পারেন না, তিনি সমস্ত রকম অসাধ্য সাধন করতে পারেন। তাঁর কৃপায় বা অসাধ্য সাধনের ফলে মৃত লোকও বেঁচে ওঠেন, তিনি নিঃসন্তানকে সন্তান লাভের বর দেন, বন্ধ্যা নারীর কোল আলো করেন, তিনি কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তুলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সাধারণ ভাবে মৃত্যুর কোন ঘটনা নেই। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা মৃত্যুকালীন ঘটনার পরিচয় পাই।

ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা জীবনচর্চার অণ্বেষন করতে গিয়ে ক্ষমতা লিপ্সু মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি গৌড়েশ্বর, মহামদ, ইছাই ঘোষ, কর্ণসেন পরভৃতই রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য অন্ত্যজ সমাজ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ঘটিয়ে সমাযে মেরুকরণের চিত্র উঠে আসতে দেখগেছি ধর্মমঙ্গল কাব্যে। রমতি নগরে দুই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক চক্রান্তের পরিচয় বহন করেছে।

এভাবেই নিম্নশ্রেণির মানুষেরা তাদের জনজীবনে বারবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এছাড়াও দেখা জায় নম্ন শ্রেণির মানুষদের দইয়ে বেগার খাটানোর প্রবণতাও মাওরা লক্ষ্য করি, জা উচ্চশ্রেণির বা জমদার সম্প্রদায়ের মানুষের ন্নির্দেশেই হয়ে থাকে। অঘোরবাদল পালায় মহামদ বেগার খাটানোর জন্য কোটালকে নির্দেশ দিয়েছে।

ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় নগরের বাইরে চণ্ডাল, জেলে, বাগদি প্রভৃতি জাতির সাথে সাথে বাইতি সম্প্রদায়ের মানুষ হরিহর বাইতিকেও বসবাস করতে দেখি; যারা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বা চর্ম সামগ্রীর কাজ করে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। তবে তারা নিম্ন

শ্রেণির মানুষ হলেও তাদ্রাও উচ্চ সম্মপ্রদায়ের মানুষের কাযে লেগেছে এবং যথাযোগ্য সম্মান লাভ করেছে। হরিহর বাইতি রাজার আনুগত্য লাভ করায় সে রাজার নির্দেশিত মন্দিরে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর আমন্ত্রন পেয়েছে, জা তার জাতিগত সত্তা ও সততার পরিচয় বহন করেছে। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য পাঠে আমরা একটি বিশেষ বিশয়কে লক্ষ্য করি। আমরা সেখানে বেশ কিছু দাস বৃত্তি কারী মহিলার প্পরিচয় পেয়েছি যারা রাণী বা রাজকন্যার সঙ্গে থেকে তাদের দায়িত্ব কর্ত্যব্য পালন করেছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শুধুমাত্র রাণীর দাসীবৃত্তি কাজেই থেমে থাকেনি, দেশ রক্ষার কাজেও তাদের অসম সাহসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। ঘনরামের কাব্যে আমরা ধুমসী দাসীর কথা শুনেছি, যে দেশ রক্ষার্থে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছে। দাসদাসীরা যথাসময়ে সুপরামর্শ দিয়ে যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে।

মধ্যযুগীয় মঙ্গল্কাব্যের ধারায় অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে যুদ্ধের প্রসঙ্গ সেভাবে নেই, তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা যুদ্ধের অবতাড়না দেখি। ধর্মমঙ্গল কাব্য বীররসাত্মক কাব্য, সেখানে যুদ্ধ প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মানুষের জীবনচর্চার ধারায় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা তাদের নিজস্ব জীবিকা বা বৃত্তি পরিত্যাগ করে নতুন জীবিকা গ্রহণ করেছে। তারা রাজার হয়ে যুদ্ধ যাত্রায় অংশ নিয়েছে। মনে হোয় তৎকালীন সময়ে যুদ্ধে ডোম শ্রেণির মানুষের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি, কেননা যুদ্ধের সর্বাগ্রে ডোম সৈন্যরা থাকত। যুদ্ধযাত্রা ব্ররণনায় ঘনরাম বণিক, তেলি, তাঁতি প্রভৃতি জাতির কথাও বলেছেন –

মধ্যযুগীয় সমাজে জীবনচর্চার ধারায় ক্ষুন্যিবৃত্তি নিবারনের জন্য খেটে খাওয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় পেয়েছি। ময়ূরভট্ট তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে খেটে খাওয়া শুঁড়ি সম্প্রদায়ের পরিচয়

দিয়েছেন, যারা নিজেদের জীবিকা হিসেবে মদ তৈরী ও বেচাও কাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে তারা শুধুমাত্র সুরা তৈরী করাই নয় অন্যান্য সময়ে তারা দিনমজুরী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে থাকে। ডম সম্প্রদায়ের নেশার রসদ যোগান দেন এই শুঁড়ি সম্প্রদায়, তা তাদের নেতা স্থানীয় চরিত্র শিবার কথায় জীবন্ত রূপে ধরা পড়েছে ঘনরামের কাব্যে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা

শুড়ি বাড়িতে যে কোন সময় আক্রমন করত সুরার জন্য। জীবন সংরামে অন্ত্যজ জাতি ডোমেদের তাদের নিজস্ব জাতিগত বৃত্তি ছেরে তাদের অন্য বৃত্তি গ্রহন করতে দেখা গিয়েছে। ডোম জাতির কথাতেই তা পরিস্কার হয়ে যায়। পুরানো বৃত্তির কথা তারা কোনভাবেই ভুলতে পারেনি। ঘনরামের কাব্যে এই রাঢ়ের অন্ত্যজ জাতির জীবন বৃত্তির কথা প্রসঙ্গ রয়েছে। তারা হতদরিদ্র্য, খুবই কষ্টের সহিত দিন অতিবাহিত করেছে। তবে নতুন রাজ্য ময়নায় এসে তারা ঘরবাড়ি, পরনের কাপড়, খাদ্য পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে পেয়েছে রাজার আনুগত্য। এখানে আমরা দেখতে পাই চুড়া যখন শাকার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তখন শাকা তাকে তার পুরানো বৃত্তির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। রাঢ়বঙ্গে চোয়ার জাতির বসবাস ছিল, তবে তারা জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন রাজার সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বসবাস করেছে এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে শুধুমাত্র পুরুষেরাই নয়, তাদের পাল্লা দিয়ে নিজেরদের মহিমা প্রকাশ করেছেন নারীচরিত্রেরা। ধর্ম্মঙ্গল কাব্যে আমরা বীরাঙ্গনা নারীচরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। তারা সমরে কতটা পারঙ্গম তার সন্ধান দিয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। কলিঙ্গা, কানাড়া, লখাই ডোমনী, ধুমসী – এদের কৃতিত্ব রাঢ় বাংলার নারী সমাজের কথা স্মরণ করায়, যারা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশ রক্ষার্থে নিজেদের জীবন দিয়েছে। তবে পুরুষদের মতো তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে হয়নি, নারী চরিত্রেরা সকলেই দেশের জন্য, নিজেদের স অস্মান বাঁচানোর তাগিদে, সত্য পালনে রণক্ষেত্রে হাজির হয়েছেন। কাব্যে কানড়া চরিত্রকে আমরা ভিন্ন রূপে দেখতে পাই, সে শুধুমাত্র একজন নারী নয়, একজন স্ত্রী নয়, সে বীরাঙ্গণা নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্মান রক্ষার্থে, দেশের কথা চিন্তা করেই কানড়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা ধুমসী দাসীর কথা পাই, যে শুধুমাত্র দাসীবৃত্তির কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি দরকারে সুপরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে সে যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল হয়েছে। আসলে যুদ্ধের রণকৌশল তার মজ্জায়, তাইতো বীর পুরুষ চরিত্রের পাশে সেও সমান ভাবে উজ্জ্বল। ময়ূরভট্টের কাব্যে ধুমসী দাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে তার কার্যকলাপের পরিচয় মেলে।

ধুমসী যেমন একজন নারী হয়েও জীবন বৃত্তীয় সংগ্রামে অগ্রগণ্য হয়েছেন, তেমনি সাহসিনী লখাই ডোমনীর মূর্তি ঘিরে অন্ত্যজ সমাজের মানুষ তাদের বাঁচার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। ডোমশ্রেণির মানুষেরা ময়নায় এসে তারা নিজেদের নতুন জীবনচর্চায় সামিল করে নিয়েছে। কালু ডোমের বীরত্বের কথা যেমন পেয়েছি, তেমনি যোগ্য স্ত্রী হিসেবে লখাই ডোমনী তার বীরিত্বের পরিচয় দিয়ে রাঢ়বঙ্গের জীবনচর্চার ধারায় নিজের জীবন সংগ্রামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধ্যযুগীয় ধর্মমঙ্গল কাব্যে নারীচরিত্র চিত্রনে কবিরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই নিজের মহিমায় মহিমান্বিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারী চরিত্রের এমন বিকাশ ধর্মমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল কাব্যে ঘটেনি।

মধ্যযুগে গড়ে ওঠা ধর্মকেন্দ্রিক বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় ধর্মমঙ্গলকাব্যে রাঢ় বাংলার নিম্নবৃত্ত ও উচ্চবৃত্ত সমাজ মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে ময়ূরভট্ট তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সেখানে উচ্চবৃত্ত মানুষের সাথে সাথে আমরা রাঢ়বঙ্গের নিম্নবৃত্ত শ্রেণির মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার যে পরিচয় পেয়েছি তা বেশ অনুপম রূপে ধরা দিয়েছে কাব্যে। রাঢ়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীননচর্চার বৈচিত্র্য ধারাকে বিভিন্ন দিক থেকে অন্বেষণ করে মনোরম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে। ধর্মভাবনাকে সামনে রেখে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি জাতি, প্রতিটি মানুষ তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তাদের একত্রিত হওয়ার প্রয়াসকে দিনকে দিন সমৃদ্ধ করেছে। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে মানুষ তাদের সামাজিক কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এক নতুন আনন্দযজ্ঞের সুচনা করেছে। ধর্মকে সামনে রেখে ডোম, চণ্ডাল, বাউরী, কর্মকার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান আমাদের

সামনে উঠে আসে। সুতরাং ময়ুরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্য মূলত ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি, সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর সমকালীন সময়ের সমাজ-সংস্কৃতি, জীবনচর্চা, সমাজ ইতিহাসও প্রতিফলিত হয়েছে। কবি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাঢ়বঙ্গের সমাজ-সস্কৃতি ও জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করে তা কাব্যমধ্যে তুলে ধরেছেন।

ময়ূরভট্ট ছিলেন পন্ডিত এবং সমাজ সচেতন কবি শিল্পী। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের কাব্যে লোকজীবন, সমাজ-সংস্কৃতির ও জীবনচর্চার যে উপাদান গুলির কথা তুলে ধরেছেন, তা কোন ব্যক্তি বা বিশেষ কালের নয়। বহুযুগের বহুলোকের ভূয়োদর্শনজাত মানস অভিজ্ঞতার ফসল। এসবের ভিত্তি বৈজ্ঞানিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও মানুষ এগুলিকে উপেক্ষাও করতে পারে না। মধযুগের সহজ-সরল গ্রামীণ মানুষেরা এগুলি থেকেই দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে ধৈর্য্য, বিপর্যয়ে বল, বেদনায় সহ্যশক্তি, ব্যর্থতায় অধ্যাবসায় ও নৈরাশ্যে আশার আলো এবং আনন্দে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ময়ূরভট্ট তাঁর কাব্যে সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান গুলির কথা তুলে ধরে যেমন সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি তাঁর কাব্যটিকে বাস্তব রস-সমৃদ্ধ করে সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিল করে তুলেছেন। তাই পরিশেষে বলতে হয় ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যটি ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য হলেও লৌকিক উপাদানের আকর হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২, পৃষ্ঠা - ৫৮৬।

২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৬।

৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৬।

৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮৬।

৫) কয়াল, অক্ষয়কুমার ও দেব, চিত্রা (সম্পাদিত) : ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, ২২-এ, কলেজ রোড, কলিকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ, **১৩৮১**, পৃষ্ঠা - ৪০।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা – ৯৩।

৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬।